দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 21 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

উপসম্পাদকীয়

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ মুহূর্তে ক্লাস হচ্ছে, শান্ত আছে বলে জানি, কাল সকালেই সংবাদপত্র খুলে এর কোন না কোনটিতে সেই আগের দিনের পরিস্থিতির কথা জানতে পারবো তা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। মারামারি, ভাঙচুর, ছাত্রহত্যা বা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিতে পারেন এমন আশংকাই সবসময় পোষণ করতে হয়। আসলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে এক ঘন্টারও নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। অতি তুচ্ছ কথাকাটাকাটি থেকে এগুলোতে ছাত্রহত্যা, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়া, ভাঙচুর, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, বন্দুকযুদ্ধ ঘটা অবিশ্বাস্য কিছু না। কারা করছে এসব কিছু, কেন করছে, কোন্ অস্ত্রবলে ও সমর্থনে এসব কিছু হচ্ছে দেশের জনগণের পয়সায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে— এই প্রশ্ন করাটি কি খুব অন্যায় কিছু হবে?

বাংলাদেশে ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্ররাজনীতির কথা বেশি উচ্চারিত হচ্ছে কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতে। তবে ব্যতিক্রম একটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে—কিছু কিছু বেসরকারি কলেজে কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রাখছে। ছাত্ররাজনীতির নামগন্ধও খুঁজে পাবেন না বাংলাদেশের ১৭-১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্ভবত খুলনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়টিকে ছাত্ররাজনীতি মুক্ত করেছে। যেহেতু দেশে সরকারি- বেসরকারি কলেজের সংখ্যা প্রায় হাজারের মতো, তাই কলেজগুলোর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো না। তবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই মুহূর্তে কি অবস্থা বিরাজ করছে সেদিকে কিছুটা দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছাত্রশিবির পাঁয়তারা করছে। ধর্ষক ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে ফিরে এসেছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বুয়েট মাত্র কিছুদিন আগে খুলেছে। সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-কর্মচারীদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের পর আপাতত ক্লাস হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আপাতত শান্ত আছে তা-ই বিস্ময়কর! ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে শান্ত আছে। তবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ মুহূর্তে ক্লাস হচ্ছে, শান্ত আছে বলে জানি, কাল সকালেই সংবাদপত্র খুলে এর কোন না কোনটিতে সেই আগের দিনের পরিস্থিতির কথা জানতে পারবো তা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। মারামারি, ভাঙচুর, ছাত্রহত্যা বা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিতে পারেন এমন আশংকাই সবসময় পোষণ করতে হয়। আসলে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে এক ঘন্টারও নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। অতি তুচ্ছ কথাকাটাকাটি থেকে এগুলোতে ছাত্রহত্যা, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়া, ভাঙচুর, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, বন্দুকযুদ্ধ ঘটা অবিশ্বাস্য কিছু না। কারা করছে এসব কিছু, কেন করছে, কোন্ অস্ত্রবলে ও সমর্থনে এসব কিছু হচ্ছে দেশের জনগণের পয়সায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে— এই প্রশ্ন করাটি কি খুব অন্যায় কিছু হবে? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগ শিক্ষকতা করে আমার মধ্যে আশার আলো জ্বালাতে পারিনি, বারবার হতাশ হয়েছি। ছাত্ররাজনীতির পরিচয়বহনকারী অনেক ছাত্রের আচরণে অপমানিত হয়েছি, খুব কাছ থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের প্রাত্যহিক জীবন, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, লেখাপড়ার মান ইত্যাদি দেখে দেশের ছাত্ররাজনীতির উপর সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা স্থাপন করে এসেছি। আমি দেখেছি সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কতখানি এদের কাছে বন্দি বা জিম্মি হয়ে আছে। ওদের বেশিরভাগই ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বদানকারী বর্তমান কোন সংগঠনকেই পছন্দ করে না, এদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না, এমনকি আমি যদি বলি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিরপেক্ষ ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের মতামত নেয়া হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী বর্তমান ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষেই ভোট দেবে, মতামত দেবে তা অনেকে বিশ্বাস করবেন কিনা আমি জানি না। তবে আমার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের যে যোগাযোগ ছিল, তার সুযোগে আমি তাদের মনের কথাটি জানতে চেষ্টা করেছি, দেখেছি— এমনকি ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মী পর্যায়েও অনেকে তাদের হতাশার কথা বলেছে, এই ছাত্ররাজনীতির তারাও কোন ভবিষ্যৎ দেখছে না। কিন্তু একবার প্রবেশ করে বের হয়ে আসতে পারছে না অনেকে।

আমার অভিজ্ঞতা মতে, বাংলাদেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংগঠনগুলোই ছাত্র-রাজনীতির ইমেজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে; টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, হল দখলকারী, রগ কাটা বাহিনী, ধর্ষক, গুন্ডা, মস্তান ইত্যাদি নামে ছাত্র-রাজনীতিকে তারাই চিহ্নিত করেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৭/৮ বছরে ধর্ষক গোষ্ঠীও তৈরি হয়েছে এই ছাত্ররাজনীতির ছত্রছায়ায়, পরিচয়ে। পৃথিবীর কোন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন গর্হিত কর্মকাণ্ড চলে কিনা আমাদের জানা নেই। আমাদের দেশেও কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র সংগঠনের নামে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডারবাজি করছে এমন খবর এ পর্যন্ত কেউ শোনেনি। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা এক হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে এ খবরও এখনো উদঘাটিত হয়নি। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন ছাত্র সংগঠনগুলো কি কি কাজ করে তা একটু দেখা যেতে পারে। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েই সবকটি ছাত্র সংগঠন প্রথম যে চেষ্টাটি করে যায় তা হলো হলে সিট পাওয়া, নিজেদের কর্মীদের জন্য সিট খালি রাখা. সম্ভব হলে গোটা হলটি দখল করে নেয়া। যে হলে যে সংগঠনের সিট বেশি সেই হলে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়— ডাইনিং হল, প্রশাসন সর্বত্র তাদের সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার করা যায়। অন্য ছাত্র সংগঠনের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা ঐ হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের মর্যাদা লাভ করে। এভাবে যত বেশি হলে কোন ছাত্র সংগঠনের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে, উক্ত সংগঠন তত বেশি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই কর্তৃত্ব যদি ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড সহ্য করা হয় না; বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ থেকে সবকিছু তারা এবং তাদের সংগঠন জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করে। রাজশাহী, কুষ্টিয়া এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি শাসনামলে উক্ত ছাত্র সংগঠন এবং তাদের মুরব্বি সংগঠন সে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় দখলকে ঐ সংগঠন সম্ভবত ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে আসছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছাত্রশিবির ঐ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের পর্যায়ে নেই, তবে তাদের কর্মীরা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক শিক্ষকবৃন্দ গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, আগামী নির্বাচনে বিএনপির জয় হবে, তখন পরিস্থিতি আবার তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে এবং তারা আর সেই ভুল করবে না— যা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কখনো দুর্বল হবে।

বিএনপির শাসনামলে ঢাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের একক প্রভাব ছিল। হলগুলোতে তাদেরই প্রভাব বেশি ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী রাতারাতি ছাত্রলীগে যোগদান করে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে হলগুলোতে শিবিরের একক কর্তৃত্ব দুর্বল হওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা স্বাধীনতা অনুভব করছে। পরিবেশ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাদের গ্রুপিং, কোন্দল, লেখাপড়া বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া ইত্যাদি কারণে প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গোটা ছাত্ররাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর ধারণা, আগামীতে সরকার পরিবর্তন ঘটলে অন্তত ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হলগুলোতে ছাত্র সংগঠনের সাইনবোর্ড পরিবর্তিত হবে; চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় দখলদারিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করবে বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তারা মনে করেন। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখা করা যাবে না, হলে থাকা সম্ভব হবে না, এমনকি মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকদের সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে ইতোমধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির নামে বর্তমানে যা কিছু চলছে তা দিন দিন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোর শক্তিকে দুর্বল ও নড়বড়ে করে ফেলছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোন সমস্যা তেমন থাকে না। মাঝেমধ্যে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কিছু কিছু দাবিদাওয়ার কথা থাকলেও তা আন্তরিক নয়, লোক দেখানো মাত্র। এর পেছনে নেতাদের ভাগ-বাটোয়ারার কোন গোপন স্বার্থ থাকার কথাই উচ্চারিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররাজনীতির সুযোগ নিয়ে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর বাইরে নেতার পরিচয় বহন করে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করার কাজে ব্যস্ত আছে। আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে মেধাবী, সৎ, নিষ্ঠাবান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্র নেতৃত্বের বড় অংশই লেখাপড়ার সাথে সম্পর্ক রাখছে না। এদের সময়ের বড় অংশই ব্যয় হচ্ছে মোবাইল হাতে, গ্রুপিং, দলবাজিসহ বিভিন্ন অসাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্থান এসব ছাত্র সংগঠনে তেমন একটা ঘটছে না। ঘটলেও তাদের জীবন অন্য ছাত্রনেতাদের মতোই ব্যতময় হয়ে উঠে। ফলে ছাত্ররাজনীতির এজেন্ডায় ছাত্র, দেশের রাজনীতি, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার বিষয় নেই। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে একপাল কর্মীবাহিনী নিয়ে ঘোরাফেরা করা, পাহারা দেয়া, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করা, প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রাখা, যেকোন ছুতানাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

বস্তুতই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা সত্যিই দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক ছাত্র সংগঠন নিজ নিজ উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে, প্রত্যেক গ্রুপ স্ব স্ব স্বার্থে প্রশাসনে যেকোন সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করে। যদি কোন গ্রুপ বা সংগঠন মনে করে, কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তাদের কারো কোন ব্যক্তিগত অসুবিধা হবে, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে অথবা শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে হলেও ছাত্র সংগঠন বা গ্রুপ তা মেনে নেয় না। এর ফলে এখন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে নিয়ম মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে, বাদ সাধছে কোন ছাত্র না কোন সংগঠন, কখনো কখনো সবকটি একত্রে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার হাজার সমস্যা রয়েছে— নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না, ল্যাব চলছে না, গবেষণা হচ্ছে না, বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে না, সেশনজট লেগে আছে, পরীক্ষা হচ্ছে না— ইত্যাদি নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। বরং কোন ছাত্রনেতার পাসের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা নেই সময়মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার, যেকোন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত ছাত্র সংগঠন